রৌরব

রজত শুভ্র কর্মকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

একটি চুক্তি, মাকড়সা এবং একটি অভিশপ্ত গিটার

১২

কালদণ্ড

৩০

মুংরি

৩৮

খোঁজ

৪৬

খোলস

৫৮

শিরা

৭৫

সময়

৮৬

জাল

৯৬

ধোঁয়া

১০৫

নিরুপমা

১১৭

একটি চুক্তি, মাকড়সা
এবং একটি অভিশপ্ত গিটার

১

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" কথাটা সেই অনেকদিন ধরে চলে আসছে। কথামালার গল্প থেকে গান অনেক জায়গাতেই কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তরটা কেউ দেননি। বাঘের গলায় হাড় ফুটলোই বা কেন? বাঘ কি একটু চিবিয়ে খেতে পারত না? নাকি বাঘের বড্ড তাড়া ছিল যে আয়কর বিভাগ আবার হানা দেবে! অবশ্য আয়কর বিভাগের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা ছুঁলে নাকি বাহাত্তর ঘা, যেখানে বাঘে ছুঁলে মাত্র আঠারো ঘা। অবশ্য আয়কর সম্পর্কে বোঝাটা খুব চাপের ব্যাপার, স্কুলে তো এই নিয়ে কিছু বলা হয় না। স্কুলে তো সেই সুদ কষা নিয়েই সব মাথা খারাপ করা শেখানো হয়েছে। ভাবতে বসলে মিলি এ'রকমভাবে ছয়ের সঙ্গে নয়ের সংযোগ প্রায় তেত্রিশ রকমভাবে করে দিতে পারে, বিশেষ করে ফাঁকা সময়ে। দুপুর দুটো থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত মিলির অফ টাইম। আর যেখানে মিলি বসে বসে তার চিন্তাভাবনাকে নিয়ে খেলে সেটা হল একটা "মিউজিক অফ বোধি", সহজভাবে একটা মিউজিক স্টোর বা বাদ্যযন্ত্রের দোকান। দোকান না বলে একটা ছোটোখাটো মিউজিয়াম বলাই ভালো। এই ছোট শহরে একটাই বোধহয় জায়গা আছে যেখানে ওয়ার্ল্ড মিউজিকের প্রায় সবরকম আনকোরা যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়। বেশিরভাগ সময় মিলি যন্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে— যদি যন্ত্রগুলো কথা বলতে পারত? যদি যন্ত্রগুলোর মধ্যে প্রাণ থাকত? প্রাণ আছে নাকি নেই? সেই আগেকার দিনে নাকি সব মহান সংগীতশিল্পীরা যন্ত্রের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন! ইউটিউব ঘেঁটে মিলি এখনো সব পুরোনো শিল্পীদের কাজ দেখে আর বোঝার চেষ্টা করে যে সেই সময় মিউজিক বা সংগীত বলতে আসলে কী হত! মিলিকে অনেক সময় ওর বন্ধুরা পাগল মনে করে ওর এই সব অদ্ভুত কাজের জন্য। আর বললেই বা কী, পাগলামিটা না থাকলে কি আর এম.বি.এ করার পরে মোদী এন্টারপ্রাইসেসের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে এই গান আর বাজনার যন্ত্র নিয়ে পড়ে থাকে? সুদ কষার অঙ্ক একদমই পছন্দ ছিল না ছোট্ট মিলির, সেখানে মোদী এন্টারপ্রাইসেসের সি.ই.ও মায়ের চাপে পড়ে ফাইনান্স নিয়ে এম.বি.এ করতে একরকম বাধ্য হয় মিলি। আর মিলির বাবারও এইসব গান বাজনা নিয়ে কোন উৎসাহ আগ্রহ কিছুই নেই, উনি অঙ্কের প্রফেসর। সুতরাং মিলির জীবনের হিসেব বা অঙ্ক বা যাই বলা হোক না কেন সেটা ঠিক হয়েই ছিল, গোলমাল হবার সম্ভাবনা ছিল না। অন্তত মিলির মা বাবা সেটা ভাবেননি। সেখানে এই হিসেবের মধ্যে গোলমালটা হল, যখন মিলি চাকরিটা পেয়েও করল না। উলটে গিয়ে ঢুকল সেই পুরোনো মিউজিক স্টোরে, আর সেখানেই রয়ে গেল। আর এই গোলমেলে কাজের নেশাটা এসেছে ওর এক দাদুর থেকে। নিজের দাদু নন, বাবার সম্পর্কে কী এক ধরনের মামা হন। সম্পর্কের এই ব্যাপার স্যাপারগুলো মিলির মাথায় ঢোকে না। এত হেজিয়ে লোকে কী পায়? ওর দাদু বোধিসত্ত্ব রায় নিজে সেতার বাজাতেন, ওয়েস্টার্ন মিউজিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল। "মিউজিক অফ বোধি" তাঁরই সৃষ্টি, আজীবন এই নিয়ে পড়ে আছেন। মিলির যখন পাঁচ বছর বয়স,

তখন উনি ওকে বুঝিয়েছিলেন সঙ্গীত বা মিউজিক কী এবং মানুষের জীবনে তার গুরুত্ব কতটা। রবি ঠাকুর, নজরুল, লালন ফকির থেকে শুরু করে বিটলস, লেড জেপলিন সবার গানের ওপর একটা ধারণা করে দিতে পেরেছিলেন। গান নিয়ে একটা উদার মানসিকতা পছন্দ করতেন রায়বাবু। যদিও গানের নামে উন্নাসিকতা আর উচ্চিংড়েপনা ঘোরতর অপছন্দ ছিল। ওঁর মূল উৎসাহটা ছিল নতুন নতুন যন্ত্র খুঁজে বের করায় আর সেটা দিয়ে নানান রকমের গবেষণা করায়। বিভিন্ন দেশ ঘুরে বাজনা জোগাড় করার একটা নেশা ছিল। ইজিপ্সিয়ান হার্প থেকে আর্মেনিয়ান ডুডুক, পেরুভিয়ান প্যানপাইপ থেকে পার্সিয়ান ডাফ এ'রকম নানা রকমের বাজনা জোগাড় করেছিলেন, সবক'টা যন্ত্র কমবেশি বাজাতেও পারতেন। একরকম গোটা পৃথিবীটাই তিনি ঘুরে ফেলেছিলেন এইসব বাদ্যযন্ত্র জোগাড় করার চক্করে। আর প্রতিটি যন্ত্রের ঠাঁই হয়েছে ওঁর দোতলার ঘরে। মিলির খুব পছন্দের জায়গা এটা, সেই ছোটবেলা থেকে। অনেকদিন হয়েছে স্কুল পালিয়ে ও মিউজিক স্টোরে বসে বোধিসত্ত্ব এবং অনাদির সঙ্গে বসে গান শুনে কাটিয়েছে। অনাদি হলেন বোধিসত্ত্বের প্রাণের বন্ধু। সমবয়সিই হবেন, চেহারাতে যদিও কোন মিল নেই। বোধিসত্ত্ব দেখতে ছিলেন সিনেমার নায়কের মত, সেখানে অনাদিকে অনায়াসে কোনও বস্তাপচা সিনেমার ভিলেন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে খুব স্টাইলিশ ভিলেন বলতে হবে। জট পড়া চুলের সঙ্গে রংচঙে স্যুট— বেশ এক অদ্ভুত ব্যাপার। দাদু মাঝেমাঝে ওকে চম্পা অনাদি বলে ডাকতেন। দুই বুড়োর খুনসুটি মিলি হাঁ করে দেখত আর ভাবত, "এ'রকমও হয়? মা হলেন একটি নামকরা কোম্পানির সেলস ম্যানেজার, সারাক্ষণ প্রোডাক্ট আর ক্লায়েন্ট নিয়েই ব্যস্ত। আর বাবা তো অঙ্কের ক্যালকুলেশন ছাড়া কিছুই বোঝেন না। বলতে গেলে বাড়ির কাজের লোকেদের কাছেই মানুষ ও। বাড়িতে মাঝে মাঝে ওর দম বন্ধ হয়ে আসত। আর অঙ্ক, অর্থনীতি, ব্যবসা এ'সবের কচকচির মাঝে একমাত্র বোধিসত্ত্ব এবং অনাদির সঙ্গে কাটানো সময়টাই ছিল খোলা হাওয়ার মতো। এম.বি.এ করার পর যখন মোদী এন্টারপ্রাইসেসের চাকরিটা ছেড়ে দেয় ও, মা রীতিমতো কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর বাবার এগুলো নিয়ে কোনো হেলদোল ছিলই না এবং এখনও নেই। তখন দাদুই একমাত্র পাশে ছিলেন। এর পরে বাড়িতে অশান্তির আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে, যখন ও ঠিক করে দাদুর সঙ্গে মিউজিক স্টোরটা সামলাবে। মা সোজাসুজি বলেছিলেন, "যদি এটাই করার ছিল তাহলে এতগুলো পয়সা খরচ করে এম.বি.এ টা করলে কেন? এখন এম.বি.এ করার পরে যখন সবাই শুনবে তুমি একটা বাজনার দোকানে বসে ব্যবসা করছ, তাতে আমাদের মান সম্মানটা কোথায় যাবে ভেবেছো? সোসাইটিতে মুখ দেখানোর আর জায়গা থাকবে না আমাদের!"

"এম.বি.এ তো করতে চাইনি, সে তো তোমার জন্য করতে হল, আর বাবার ক্যালকুলাস না ছাতার মাথা কী আছে, তার বাইরে যদি কিছু চোখে পড়ে!"

বিড়বিড় করে বলেছিল মিলি।

এইভাবে এক কথা, দু' কথা করে শেষমেশ ফলাফল দাঁড়াল যে,

"যেখানে খুশি যাও, জাহান্নামে যাও। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি ইওর ফেস।"

মিলি সেইদিন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল একটু। আর ভাবছিল, মিশ্র অনুভূতি কি এটাকেই বলে? মা এ'কথা বলবেন, ভাবেনি! বাড়ির হর্তা কর্তা বিধাতা মা-ই। তাঁর হুকুম ছাড়া একটা জিনিস নড়ে না বাড়িতে, কিন্তু ভাবছিল এটা আদৌ ওর মা তো? নাকি মোদী এন্টারপ্রাইসেসের সি.ই.ও? আর ভেবে ভালো লাগছিল যে দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে বেরোতে পারবে এবার। সেইদিন দুপুরেই দাদুর বাড়িতে চলে আসে ও। আর সেই থেকে পাঁচ বছর হতে চলল সেখানেই আছে। দাদুর বাড়ি মানে আসলে ওই দোকানটাই। বা এটাও বলা চলে দাদু তাঁর বাড়ির একতলাটায় দোকান বানিয়ে নিয়েছেন, আর ওপর তলায় তিনি থাকেন তাঁর আজব মহলে। ছোটবেলায় মিলি যখন আসত, তখন গুচ্ছের বই আর বাজনার মধ্যে থাকতে তার আজব লাগত খুব। সেই থেকে দাদুর বাড়ির নাম দিয়েছিল— আজব মহল। আর ও জানত যে বোধিসত্ত্ব ভীষণ বাউণ্ডুলে রকমের। যখন তখন এদিকে সেদিকে বেরিয়ে পড়ার একটা বাতিক আছে তাঁর। মাঝে মাঝে কয়েক মাসের জন্য হাওয়া হয়ে যেতেন, আবার ফিরেও আসতেন। সঙ্গে কিছু পুরোনো যন্ত্র থাকত, নয়ত গায়ে থাকত কিছু শুকনো ক্ষতচিহ্ন। আর দাদুর অবর্তমানে দোকান আর ঘর সামলানোর দায় থাকত অনাদির ওপর। লোকটার পদবি কী মিলি জানে না, একবার জিজ্ঞেস করতে অদ্ভুত টানা টানা বাংলায় বলেছিল, "আরে বিটি, তুম আমার ফ্যামিলি নাম জানিয়ে কী করবা? আমি অনাদি, চম্পা অনাদি। এই হলাম আমি, ব্যস, বাকি সব বুজরুকি। সব জালের মধ্যে ঘুরছে, আর কী জানো তো একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল! এটাই হল গিয়ে কথা! সমঝা?" কথার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, কী যে বলে গেল মিলির মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু ভালো লেগেছিল খুব। যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে আসে দাদুর সঙ্গে, খুব মন খারাপ ছিল ওর। অনাদি কী করে খবর পেয়েই চলে আসেন দাদুর বাড়িতে, আর সেইদিনই প্রথম রিয়া গাঁজা টেস্ট করে। বোধিসত্ত্ব আর অনাদি নিজে চেন স্মোকার, মিলির বলতে বাধা নেই যে, প্রথম সিগারেটে টান ও ওঁদের সঙ্গেই দেয়। আর সেইদিন অনাদি হালকা করে একটা বব মার্লের গান চালিয়ে দিয়েছিলেন আর জীবনের প্রথম জয়েন্ট দিয়েছিলেন মিলিকে।

"দম মেরে দেখো মিলি বিটি, সব দুঃখ দূর, মন ফুরফুর। আর এদিকে শোনো, বব গাইছে।"

দাদু রেগে মিউজিক পছন্দ করতেন না, রেগের কথা শুনেই রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "আবার গাঁজাখুরি গান শুরু করেছিস? এই বাড়িতে সব চলবে, কিন্তু এই গাঁজাখুরি রেগে আর ওই হিপহপ টেকনো এইগুলো বাদে।"

"আরে বোধি তুই তো মোর বাডি, তুইও টান দে একটা!"

দাদু গজগজ করতে করতে দিয়েছিলেন দুই টান, আর তরজা চরমে উঠেছিল রবীন্দ্রসংগীতে অতিরিক্ত যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে। আর মিলি ভাবছিল, দুপুরের দমবন্ধ করা অবস্থার থেকে বোধহয় শেষমেশ একটু মুক্তি এল। গাঁজার ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছিল ঘর, আর ওদিকে তখন চলছে, "আই শট দা শেরিফ, বাট আই ডিডন্ট শুট দা ডেপুটি!"

২

আজ মিলির জন্মদিন, আজকের দিনেই পাঁচ বছর আগে ঘর ছেড়েছিল ও। মা কোনওদিন দেখা করতে আসেননি, কিন্তু মাঝেমাঝে কিছু ই-মেল পাঠাতেন, আর মিলির জন্মদিনে বা কোনো বিশেষ উৎসবের দিন একটা করে পার্সেল। তাও সেটা মা পাঠাচ্ছেন, না একজন সি.ই.ও পাঠাচ্ছেন সেটা বোঝা মুশকিল। হয়তো আজও একটা শুকনো গিফট বা কার্ড বা এই জাতীয় কিছু আসবে। বাড়িতে এখন একাই আছে মিলি, দাদু আগের বারের মতো এ'বারও হাওয়া। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন কিছু বলেননি। দু'বেলা কাজের মাসি এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে, রান্না করে দিয়ে যায়। আর দাদুর অনুপস্থিতিতে মিলি বেশ ভালোমতোই দোকান সামলাচ্ছে, লোকজন আসে মাঝে সাঝে, দেখে, দেখে অবাক হয় আর চলে যায়। কখনও কখনও একটা দু'টো গিটার বিক্রি হয়েও যায়। আজ যেমন এক ভদ্রলোক সকালের দিকে এসে একটা হারমোনিয়াম দেখে গেলেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। বাচ্চা মেয়ে, মেরেকেটে পাঁচ ছ' বছর হবে হয়তো। হারমোনিয়ামটা দেখে বলে গেলেন, দু'দিন পর নেবেন বলে কিছু অ্যাডভান্সও করে গেলেন। খদ্দের বেরিয়ে গেল, মিলি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, বোসের স্পিকারে আবার রামকুমার চট্টোপাধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠলেন, "তুমি কাদের কুলের বৌ গো তুমি..."

আর রামধনু রং নিয়ে দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন একমেবদ্বিতীয়ম শ্রীমান অনাদি।

"বিটি আজকে কী চলছে? রামকুমার বাবু, আহ্, দারুণ। এর সঙ্গে কিন্তু যদি কেউ একটা রেগে স্টাইল নিয়ে গিটার বাজিয়ে দেয়, বেশ হবে কিন্তু!"

"ওহ অনাদি দাদু, প্লিজ। আর বলো না। এই জিনিসের সঙ্গে আবার গিটার? মানে মাথাটা ঠিক আছে তো? নাকি সকাল সকাল বাবার প্রসাদ টেনে এসেছো!"

"বাবার প্রসাদ না? হ্যাঁ, বাবার প্রসাদ-ই বটে! এককালে দেখা করতে যেতুম, মানে দূর থেকেই দেখে চলে আসতুম। নন্দীর সঙ্গে বসে এক ছিলিমে গাঁজা খেয়েছি। এখন বাবা বোধহয় আরও উপরে কোথাও চলে গেছেন। আর দেখা পাওয়া যায় না!" অনাদি আপন মনেই বকে যাচ্ছিলেন।

"কী গো! কী সব বকে যাচ্ছো?"

"আরে বিটি, তুম টেনশান মত্ লো। আমার বাতিক আছে বকার। জানোই তো। এই নাও, বিরিয়ানিটা নিয়ে এসেছি, খাও।"

"বাহ্, কোথা থেকে আনলে? ওই পাশের রেস্টুরেন্টের থেকে? ওরা ভুলভাল মাংস দেয়নি তো? যা সব শুরু হয়েছে এই ভাগাড় নিয়ে।"

"না, আমার সঙ্গে কোনো চালাকি চলবে না এটা ওরা জানে। চোখে রাখি বুঝলে? হে হে। চলো চলো, শুরু করো।"

চিকেন বিরিয়ানির প্যাকেটটা খুলে খাওয়া শুরু করল মিলি। বেড়ে করেছে বটে! অনাদিকে যেন একটু চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল আজকে।

"কী হয়েছে অনাদি দাদু? কী ভাবছো?

"বোধি এবারে বড্ড টাইম লাগাচ্ছে! টেনশন হচ্ছে একটু।"

"হ্যাঁ সেটা ঠিক। এ'বারে প্রায় সাত মাসের ওপর হতে চলল। আগে এতটা সময় লেগেছিল কখনও?"

"লেগেছিল মানে— সেই যে'বার ঘানাতে গেছিল। একটা মানুষের হাড় দিয়ে তৈরী বাঁশি আর একটা জেম্বে জোগাড় করতে। দুটোই প্রায় আটশ' বছরের পুরোনো, দেখেছো তো বিটি ওই দুটো?"

মিলি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ ও দেখেছে। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে।

"সেই যে গেছিল, জ্বরে ধরেছিল ওকে। ডাকাতের ভয় ছিল না, সেইজন্য প্রোটেকশন দেওয়াই ছিল। কিন্তু জ্বরে ভুগে আসতে আসতে ওর প্রায় মাস চারেক লেগে গেছিল।"

"হুম, তা এবারে তো সাত মাস হয়ে গেল। দাদু এমনিতেই চিঠি খুব একটা পাঠায় না, কিন্তু খবর দেওয়ার একটা না একটা ব্যবস্থা করে নেয় ঠিকই। মাঝেমাঝে চিন্তা হয় দাদুর জন্য।"

"আসলে মিলি বিটি, চিন্তাটা আমারও হচ্ছে, সাতটা মাস, আর ওদিকে দেখতে পাচ্ছি না ওকে। বুঝতে পারছি না কারুর খপ্পরে পড়েছে কিনা!"

"খপ্পরে পড়েছে মানে? কোথায় গেছে এবারে তুমি জানো? আমাকে তো কিছু বলেও যায় না। আমি যেতে গেলে নিয়েও যেতে চায় না।"

"আরে বিটি, তুম চলা জায়েগা তো দুকান ক্যাইসে চলেগা? বাৎলাও? তুমি আছো বলে তো বোধি এতটা ভরসা পাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাবো একটু!"

"হ্যাঁ, আর দাদু ওদিকে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে! কোথায় গেছে সেটা বললে না তো?" মিলি গজগজ করতে করতে বলে।

"ও গেছে এবারে মার্কিন দেশে!" ফ্যাকাশে হেসে বললেন অনাদি।

মিলির চোখ কপালে উঠল, "মানে? দাদু স্টেটসে গেছে আর আমাকে একবার বলেনি? দিস ইজ নট ফেয়ার! হবে না, দাদু আসুক, দাদুর সঙ্গে আড়ি।"

"হাঁ বিটি, আগে আসুক তো!" অনাদির কপাল থেকে ভাঁজটা সরছে না। ব্যাপার আছে কিছু, না হলে যে অনাদি সারাক্ষণ একটা হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে, তাঁর অদ্ভুত ফিলোজফি দিয়ে বেড়ান, তাঁর কপালে ভাঁজ! মনে পড়ল মিলির, বেরনোর আগে অনাদি আর দাদুর মধ্যে লম্বা তর্ক হয়েছিল,

"বাড়ি, যাওয়াটা দরকার? মানে, না গেলে হয় না? যেটা খুঁজছ ওটার মালিকের কিন্তু ডেথ খুব অস্বাভাবিক ছিল।"

"সেজন্যই ওটা দরকার অনাদি, ওটা পেলে আমার লাইফের সবচেয়ে বড় জিনিসটা পাওয়া হবে। আর অনেকদিন বেঁচেছি, তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ অনেকবার, এবারে এটা নিতে গিয়ে যদি কোনো ভাবে চলেও যাই, অসুবিধে নেই।"

"ভেবে দেখো বাড়ি, আরেকবার ভাব। খুব ঝুঁকি হয়ে যাবে কিন্তু।"

"সেটা জেনেই তো যাচ্ছি, একটাই ভরসা যে আমার এই কালেকশন, দোকান সব কিছু মিলির কাছে আছে। ও আছে মানে আমি নিশ্চিন্ত।"

সাত মাস আগের কথাগুলো মনে পড়ল মিলির। খালি হয়ে যাওয়া প্যাকেটটা বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসার পরে ভাবল যে, অনাদির জন্য জিমি ক্লিফের